Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমীদার দর্পণ' সমসাময়িক প্রেক্ষিতে

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	খালেদ হোসাইন
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.6
Pages	77-94
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মীর মশাররফ হোসেনের 'জমী

Check for updates

সমসাময়িক প্রেক্ষিতে

খালেদ হোসাইন

মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানে যে, তিনিই প্রথম মুসলমান সাহিত্যিক যিনি আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থটির জন্যই বাঙালী পাঠক মানসে তাঁর প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদী। 'বিষাদ-সিন্ধু'র খ্যাতির প্রকট ঔজ্জ্বল্য তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে ম্লান করে দিয়েছে। অথচ উক্ত গ্রন্থটির পূর্বে, পরে এবং সমকালে সৃষ্ট মশাররফের যে সাহিত্য-সম্ভার তা সংখ্যার প্রাচুর্যে, বিষয়বস্তুর গৌরবে, আঙ্গিক-বৈচিত্র্যে কিংবা সামাজিক উপযোগিতায় মোটেও অবহেলাযোগ্য নয়। সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের আলোকে বিবেচনা না করলে যে একজন শিল্পীকে পুরোপুরি অনুধাবন করা যায় না একথা নতুন ক'রে বলার অপেক্ষা রাখে না। মীর মশাররফ হোসেনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির জন্যেও তাই তাঁর প্রধান-অপ্রধান সমস্ত সৃষ্টিকর্মের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

মীর মশাররফ হোসেনের রচনাগুলোর মধ্যে একজন সমালোচক তিনটি ধারা আবিষ্কার করেছেন: "প্রথম ধারার মধ্যে আছে রূপকথা বা পুথিপত্রের দ্বারা প্রচলিত কাহিনী। দ্বিতীয় ধারায় দেখা যায় দেশের বাস্তব ঘটনা বা সমাজের বাস্তব অবস্থাকে অবলম্বন করে রচিত কাহিনী। তৃতীয় ধারায় পাওয়া যায় ধর্মমূলক কাহিনী।"[১] এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ধারার অর্থাৎ সমাজচেতনামূলক রচনাগুলোর মধ্যে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' এবং 'জমীদার দর্পণ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজবাস্তবতা-নির্ভর 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। মীর মশাররফ হোসেনের নাটক এবং

নাটক-জাতীয় রচনার সংখ্যা অল্প না হলেও মশাররফ-মানসের পরিপূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় 'জমীদার দর্পণ' নাটকটিতেই। এ নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে মশাররফ শুধু সমাজমনস্কতার পরিচয়ই দান করেননি, তিনি পরিচয় দিয়েছেন অসাধারণ দেশাত্মবোধের, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এবং অসমসাহসিকতার।

এক

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক জন্মগত, অবিচ্ছেদ্য এবং চিরন্তন। সাহিত্যের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা, যা সামাজিক মানুষের মহত্তম আবিষ্কার। সাহিত্যের স্রষ্টা সামাজিক মানুষ। তিনি যে দেশে এবং যে কালে বাস করেন তাঁর উপর সেই দেশ-কালের প্রভাব পড়ে অনিবার্যভাবে। ফলে, তিনি যা-ই রচনা করুন না কেন, তার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না-হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বকালকে আবিষ্কার করা সম্ভব। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনমনের বিনোদনের আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা কখনো-কখনো লক্ষ্য করা গেলেও অপেক্ষাকৃত সংবেদনশীল ও সচেতন লেখক তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যাবতীয় অবক্ষয় ও অনাচারকে দূরীভূত করে জনগণের কল্যাণকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস পান। মীর মশাররফ হোসেনের অধিকাংশ রচনা সম্পর্কে এ-কথা পুরোপুরি প্রয়োগ-যোগ্য। তাঁর জনকল্যাণকামী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'জমীদার দর্পণ'।

'জমীদার দর্পণ' মীর মশাররফ হোসেনের উদ্দেশ্যমূলক রচনা। ক্ষুদ্রকায় এই নাটকটির মাধ্যমে তিনি সামন্ততন্ত্রের দুষ্ট ক্ষতকে চিহ্নিত করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আক্রমণেও ব্রতী হয়েছেন। জমিদারদের নির্দয় নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত কৃষকশ্রেণীর তথা সাধারণ মানুষের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ 'জমীদার দর্পণ' রচিত হবার পশ্চাতে সক্রিয় ছিলো। এ নাটকটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ কালের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করলে সত্যের ব্যত্যয় হয় না।

দুই

বাংলা নাটকের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মৌলিক বাংলা নাটক লিখিত হয়নি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই

এদেশে সংস্কৃত নাটক ছিলো। মধ্যযুগের নাটগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কথকতা, পাঁচালী, কবিগান, যাত্রা, ওরজা, ঝুমুর প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাঙালীর নাট্যস্বভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে। উত্তাল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে বাংলা নাটক জন্মলাভ করে এবং জন্মলগ্ন থেকেই সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে।[২]

প্রথম বাংলা নাটক রচিত হয় ১৮৫২ সালে। এ বৎসরে রচিত তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' রূপকথাভিত্তিক হলেও এর পরবর্তী বৎসরে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকে ধরা পড়ে বাংলার এক নিষ্ঠুর সামাজিক সমস্যা। এরপর থেকে সামাজিক সমস্যাই হয়ে ওঠে বাংলা নাটকের প্রধান উপজীব্য, সে যুগের কুপ্রথাগুলোর উপর একের পর এক আঘাত হানতে থাকে বাংলা নাটক। "ব্যক্তিক জীবনগত সঙ্কটের চেয়ে সমাজ-জীবনের সামগ্রিক সঙ্কটই এগুলোর মধ্যে উদাহৃত। সঙ্কটের অন্তর্নিহিত রূপ কিংবা সত্তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন—একান্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সমস্যাই যে এর অবলম্বনীয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"[৩]

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এ কারণেই ১৮৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত 'কুলীনকুল সর্বস্বে'র ছাঁচে সমাজ সংস্কারমূলক নাটক যত রচিত হয়েছে তার তুলনায় ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কিংবা রোমান্টিক নাটক রচিত হয়েছে অল্প। নাটকগুলো পর্যালোচনা করলে উনিশ শতকের সমাজসংস্কারমূলক বিবিধ আন্দোলনকে নাটক কী ব্যাপকভাবে ধারণ করেছে তা উপলব্ধি করা যায়। নাটক রচনার মাধ্যমে নাট্যকারদের সমাজসংস্কারের মানসিকতাও নাটকগুলোতে সুপরিস্ফুট।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যজগতে প্রবেশের পর বাংলা নাটকের সম্ভাবনার দ্বার অবারিত হয়। সমাজ তথা জন-জীবন ঘনিষ্ঠ নতুনতর বিষয়কে তাঁরা তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু করেছিলেন, সমাজতাত্ত্বিক বিচারে যার মূল্য অপরিসীম। ১৮৬১ সালে রচিত মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' রাজস্থানের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটেছে। আর দীনবন্ধু মিত্র নীলকরদের অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে স্পর্ধা ভরে প্রতিবাদ ও

বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তাঁর 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) নাটকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের নাট্যকারগণ ছিলেন মূলত সংগ্রামী চেতনার রূপকার। মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে দিয়ে স্বদেশবাসীকে দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের নব প্রেরণায় উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু দীনবন্ধুর সমাজচেতনা আরো তীক্ষ্ণ এবং লক্ষ্যভেদী। তিনি বিদ্রোহ করেছেন খোদ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে।

'নীলদর্পণ' নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য চির-স্মরণীয়। এ নাটকটিকে বাংলা গণসাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'নীল দর্পণ' আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টিই শুধু করেনি, নাট্যসাহিত্যকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলো। সমসাময়িক কালের শোষণ ও নির্যাতনের মর্মান্তিক কাহিনীকে অবলম্বন করে এরপর গড়ে উঠেছিলো দর্পণ-নাটকের একটি বিশেষ ধারা। এগুলোর মধ্যে অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৮৭১), প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), যোগেন্দ্র ঘোষের 'কেরাণী দর্পণ(১৮৭৪) এবং দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' এবং 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলোর উপজীব্য সমসাময়িককাল। প্রতিটি নাটকেরই অত্যাচারী প্রতিপক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের পক্ষে কলম চালনা করে তাঁরা যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে শ্লাঘাযোগ্য। তবু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে প্রতিটি দর্পণ নাটকই পরিপূর্ণ সার্থকতাকে ধারণ করতে পারেনি। এগুলির মধ্যে সামগ্রিক বিবেচনায় মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

'জমীদার দর্পণ' মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় নাটক। তাঁর প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী' ছিলো সমাজের উঁচুস্তরের মানুষদের নিয়ে কাল্পনিক উপাখ্যান। সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা সেখানে পরিপূর্ণ ভাবেই অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'জমীদার দর্পণে' সাধারণ মানুষের দুঃখ-গাথাকেই তিনি রূপায়িত করেছেন। এ নাটকটিতে আমরা সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাত লক্ষ্য করি। সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ এখানে তাঁর সক্ষোভ আক্রমণের শিকার।

'জমীদার দর্পণ' নাটক রচনার কালটি ঐতিহাসিক কারণেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণ' নাটকটি যেমন রচনা করেছিলেন নীলচাষীদের বিদ্রোহের এক চূড়ান্ত কাল পর্বে, মীর মশাররফ হোসেনও তেমনি তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি রচনা করেছিলেন কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে, ১৮৭৩ সালে। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো।

প্রাচীনকাল থেকে কৃষকরা জমির উপর যে অধিকার ভোগ করে আসছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পর ক্রমে ক্রমে সেই অধিকার অপহৃত হয়ে অর্পিত হয়েছিলো জমিদারদের হাতে:

> তাছাড়া জমিদারেরা দফায় দফায় অবৈধ আদায় নতুন জরীপ প্রণালী প্রবর্তন করে জমি চুরি, খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ করের কবুলিয়ত গ্রহণ—এসব চালাতে থাকলে কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়।[৪]

এই বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হলেও এর মধ্য দিয়েই কৃষকরা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির তাৎপর্য পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এমন একটি সময়ে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি রচনা ও প্রকাশ করেন। সাধারণ চাষীদের প্রতি জমিদারদের অত্যাচার 'জমীদার দর্পণে'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জমিদারদের অত্যাচারের কথা পূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলালে' বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হলেও এই বিষয়ে 'জমীদার দর্পণ'ই বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে মীর মশাররফ হোসেন জমিদারদের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন:

> প্রজার উপর জমীদারের অত্যাচার, শোষিতের উপর শাসকের নিষ্ঠুর পীড়নের চিত্রণই 'জমীদার দর্পণে'র মূল লক্ষ্য। সেদিক থেকে মশাররফ হোসেন এই শীর্ণকায়গ্রন্থটিতে শাসক শ্রেণীর মুখোস খুলে তাদের কুৎসিত রূপকে আশ্চর্য দক্ষতায় জন-সম্মুখে তুলে ধরেছেন।[৫]

'জমীদার দর্পণে' মশাররফ জমিদারদের ছবি এঁকেছেন সত্যি, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সে-ছবি পূর্ণাঙ্গ নয়, খণ্ডিত। জমিদারদের চরিত্রের একটিমাত্র দিককেই তিনি উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। কৃষকদের উপর জমিদারের নির্যাতন এ-নাটকের বিষয়বস্তু হলেও পাবনার কৃষক-বিদ্রোহকে তিনি তাঁর নাটকের পটভূমি করেননি। জমিদারী শোষণের নগ্নরূপ পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরার সুযোগ ও সম্ভাবনা-কেও মশাররফ গ্রহণ করেননি। দেশের অধিকাংশ মানুষই মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ অর্থাৎ কৃষক। সেই কৃষকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপরিসীম। সহানুভূতির সঙ্গে তিনি অত্যাচারের মুখে কৃষকদের অসহায় অবস্থা তুলে ধরেছেন সত্যি কিন্তু কৃষকেরা যে সে-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে তাদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তেমন কাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত নাটকটিতে অনুপস্থিত। জমিদারের শ্রেণীচরিত্র অপেক্ষা ব্যক্তিচরিত্র উদ্ঘাটনকেই নাট্যকার অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে সামন্ততান্ত্রিক জমদারী প্রথার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার মতো কোন সাহিত্য 'জমীদার দর্পণে'র পূর্বে সৃষ্ট হয়নি।

স্বল্প পরিসরের একটি নাটকে জমিদারদের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই জমিদারী-প্রকৃতির অনুষঙ্গ-উপাদানগুলোর ব্যাভিচারী দিকটিকেই মশাররফ তাঁর নাটকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার একটি মর্মদাহী দিককে উলঙ্গভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। বাংলার কৃষক-সমাজের নিঃস্ব-রিক্ত রূপটিকেই শুধু তিনি তুলে ধরেননি, তিনি শাসন ও বিচারের নামে ইংরেজদের যথেচ্ছচারিতার স্বরূপকেও সুকৌশলে উদ্ঘাটন করেছেন। এ নাটকের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের মধ্যে জমিদারদের সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণের একটি চালচিত্র পাওয়া যায়।

তিন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের কৃষকদের উপর জমিদারদের নির্যাতনকে অবশ্যম্ভাবী ও নিষ্কণ্টক করে তুলেছিলো। এ ব্যবস্থার ফলে নতুন এক জমিদার শ্রেণীর উদ্ভভ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার জমিদরকে জমির একমাত্র মালিক হিসেবে স্বীকার করে নেয়। জমিদার

ও তালুকদারদের উপর ধার্যকৃত সরকারী জমা চিরকাল অপরিবর্তিত রাখার অঙ্গীকারও সরকার ঘোষণা করেন। এই অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যেসব অসৎ কর্মচারী বিপুল বৈভবের মালিক হয়েছিলো তারা এবং তাদের অনুগামী মুৎসুদ্দী, মহাজন ও বেনীয়ারা জমিদারে রূপান্তরিত হয়।

এইসব জমিদাররা সংযমহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবন যাপন করতো। উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের সেই ব্যাভিচার-পরায়ণতার যেমন অসংখ্য চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় সাধারণ কৃষক অর্থাৎ রায়তদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের অসংখ্য ঘটনা।

জমিদারদের অত্যাচারের কিছু ঘটনামাত্র আমরা জানতে পারি তৎকালীন পত্র-পত্রিকার বদৌলতে:

> পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও ইজারাদার ও বাড়ীদারদিগের অত্যাচারের ব্যাপার আমরা পুনঃ ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাকি, ঐ সকল দৌরাত্ম্য কোনকালে নিবারণ হয় এ মত বোধ করি না, দীন দুঃখিদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণনা করিতে আমাদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণা রসে আর্দ্রা হইতেছে··· ।[৬]
>
> বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরাপার্জ্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর এ কারণ তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সে অধিক সুদে কর্জ্জ লইয়া মহাজনের নিকটে নিয়ত বদ্ধ রহিয়াছে,··· কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণতুল্য কঠিনান্তঃকরণও করুণায় আদ্র হইয়া যায়,··· ।
>
> ···কৃষকের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি আপনার উপার্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, এ কারণে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সম্পূর্ণ পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সাহায্য করে, এবং অসিদ্ধান্ত ও সমাজ শাকাদি ভোজনেই সংতৃপ্ত থাকে,···এমত দুঃখি কৃষক বিস্তর আছে, যাহারা সময় বিশেষে দিনান্তে আহার প্রাপ্ত হয় না··· ।[৭]

সাধারণ কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচার ছিল বহুমাত্রিক এবং বিচিত্র। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকে এর একটি বিশেষ দিককে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। জমিদারদের পাশবিক প্রবৃত্তির হাত থেকে সাধারণ মানুষের মা-বোন-স্ত্রীও যে রক্ষা পেত না—তারই একটি বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন মশাররফ। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমিদারী অত্যাচারের এবং কৃষকদের নির্যাতিত জীবনযাত্রার যে ইঙ্গিত এই নাটকটিতে পাওয়া যায় তার মূল্য ন্যূন নয়।

জমিদার প্রজার বা রায়তের রক্ষক। কিন্তু নিজেদের কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে জমিদারদের কোন আয়াসের প্রয়োজন পড়ে না। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' এ প্রবাদ বুঝি বাঙলার ভূস্বামীদিগের ব্যবস্থার দৃষ্টেই সূচিত থাকিবেন। ভূস্বামী স্বাধিকারে অনুষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্বদা শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগের যথা-সর্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহাদিগের দারিদ্র্যদশা, শীর্ণ শরীর, ম্লান বদন, অতি মলিন চীর বসন, কিছুতেই তাহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না, কিছুতেই তাহার কঠোর নেত্রের বারিবিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না।[৮]

> তাহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহার-দিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীতবস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাহারদের এই প্রকার অখণ্ড অনুমতি আছে, যে কোন মূল্যে বিনা বেতনে তাহারদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজীবীরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যান-বাহকে বহন করিবেক, চর্মকারে চর্মপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারদিগের সেবা করিবেক। ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না। সেও স্বীয় কার্যের বেতন স্বরূপ অন্ন-বস্ত্র-প্রাপ্ত হয়।[৯]

জমিদার বংশে জন্মলাভ, লালিত-পালিত এবং রুটি রুজীর সংস্থান হলেও জমিদারদের আচরণের রূঢ়তা এবং নিষ্ঠুরতা মশাররফকে দারুণভাবে মর্মাহত করেছিল। বৃটিশ সরকার-সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর প্রজা-পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য মশাররফের নিকট অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। জমিদারদের ঘনিষ্ঠ-পরিজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের এই চরিত্রহীনতাকে এবং তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারকে বেদনাদীর্ণ চিত্তে তাঁর 'জমীদার দর্পণে' তুলে ধরেছেন।

'সর্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী' প্রজা পালকগণ ক্ষমতায় বিভোর হয়ে যে অমানবিক অনাচারে নিজেদের নিয়োজিত রাখতো—তা তাদের জানোয়ারের সমতলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। 'প্রস্তাবনা' অংশে নট ও সূত্রধারের কথোপকথন সূত্রধার 'রক্ষকের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি' সবলের 'অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যের' কথা জানালে নট যখন বলে—

> কেন এ অপানার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী-নির্ধনী, সুখী দুঃখী, সকলি সমান। সকলি সমস্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান।"

তখন সূত্রধার ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বলে—

> আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর। শহরে তাদের কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র হিংস্রতা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু, পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।"

সূত্রধার এই মানুষরূপী পশুদের আরো স্পষ্ট করার জন্য বলে—

> এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশে পাসে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে।

এসব উক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন জমিদারদের কর্মকাণ্ডের বীভৎসতার প্রকৃতি যথার্থভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গ্রামের প্রজাদের অমানুষিক নির্যাতন করে অর্জিত খাজনার পয়সা নিয়ে জমিদারগণ ভীড় করতো কোলকাতায়। সেই পয়সা ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেয়ে উড়িয়ে পেতো বিকৃত সুখের আস্বাদ। শুধু তাই নয়—একাধিক রক্ষিতা রাখার অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত রাখতো তারা নিজেদের। নারীর শরীরের প্রতি ছিল পশুসুলভ লালসা। তাদের এই লালসার অসহায় শিকার হতো গ্রামের দরিদ্র নিরন্ন মা-বোন। নট নটীর গানেও এরই চিত্র আমরা পাই—"মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার। কত জনে করে করে জমিদার।"

কিন্তু এতো অত্যাচার ও নিপীড়ন করেও জমিদার-চিত্ত প্রশমিত নয়—ফলে বিগত কালের জন্য হায়ওয়ান আলীর আফসোস সুতীব্র। নুরুন্নেহার ধর্ষণের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হিসেবে আবু মোল্লাকে ধরে আনতে লোক পাঠিয়ে তাই সে বলে—

> সাবেক আমল হলেও কোনদিন কাজ শেষ ক'রে দিতুম। তা কি বলবো। এখানকার আইন খারাপ। মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল···

আরো বলে—

> আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন ল'র মার প্যাঁচ বোঝে।

জমিদারদের নির্যাতন তো আছেই তাদের কর্মচারীরাও দরিদ্র প্রজাদের অত্যাচার করতে ছাড়তো না। আবু মোল্লাকে ধরে আনার জন্য প্রেরিত কর্মচারীদের উক্তি ও আচরণে এর বিস্তৃত প্রমাণ বিধৃত হয়েছে। আদিষ্ট হয়ে আবু মোল্লাকে ধরে আনতে গিয়েও তারা আবু মোল্লার কাছে পাঁচ টাকা 'কোমর-খোলাই' দাবী করে—যা আবু মোল্লার মতো গরীব চাষার পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত :

জামাল। দিচ্ছি কি? ক'টাকা দিবি? আগে টাকা আন, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো? তেরা বাতসে বায়ঠেকা? চল। (গলা ধাক্কন)

জামাল। আন পাঁচজনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন, বলছি। তা না দিস, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান মলতে মলতে কাছারি মুখো করবো (ঘাড় ধারণ)।

এই কর্মচারীরা আবু মোল্লাকে ‘পৃষ্ঠে চার পাঁচটি মুষ্টি প্রহার’ করে। জমিদারদের কর্মচারীদের অত্যাচার প্রসঙ্গে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লিখেছিলো :

যে সকল ভূস্বামী আপনার অধিকারে অবস্থিতি করেন না, তাহাদের প্রজাদিগকেও কেহ যেন সুখী বোধ না করেন। তাহারদিগকে ভূস্বামীর ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ ও রক্তাক্ত দৃষ্টি সহ্য করিতে না হউক, কিন্তু তাঁহার নিয়োজিত ব্যাঘ্র-সম নিষ্ঠুর স্বভাব কর্মচারীদিগের কঠোর হস্তে সর্বদাই পতিত হইতে হয়। তাহাদের কর্ণ কুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।[১০]

মোসাহেব পরিবেষ্টিত জমিদাররা অবসর সময় কাটাতো তাস খেলে ও লালসা-সংক্রান্ত সস্তা তরল রসিকতা করে। আবু মোল্লাকে ধরে আনবার অবসরে মোসাহেবদের সঙ্গে তাস খেলায় এর পরিচয় আছে—

দ্বিতীয় মোসাহেব। প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়? আপনার নিকটে বিবীর বড় বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি। বিবী যে আর ছাড়ে না।

হায়ওয়ান। বিবী ছাড়ে বৈ কি, সাএবই ছাড়ে না। খেল না। দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্যে কত খানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাএবের পানে ফিরেও তাকায় না।

আবু মোল্লাকে হায়ওয়ান আলীর কর্মচারীরা ধরে নিয়ে এলে হায়ওয়ান কোন কারণ ছাড়াই তার কাছে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দাবী করে, যা তার পক্ষে পরিশোধ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ আবু মোল্লাকে

এখানে বন্দী রেখে ওর স্ত্রী নুরুন্নেহারকে প্ররোচিত করা হায়ওয়ানের উদ্দেশ্য। হায়ওয়ান যে শাস্তির আদেশ দেয় তা শুধু নির্মমই নয়, অমানবিকও বটে—

> "হায়।···ওকে চোদ্দ পোয়া ক'রে মাথায় ইট চাপিয়ে দে—তা না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না।"

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর পত্র-পত্রিকা থেকে জমিদারদের শাস্তি প্রদানের আরো অনেক পদ্ধতির কথা জানতে পারি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি শাস্তির তালিকা দ্রষ্টব্য:

> ১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত ২। চর্মপাদুকা প্রহার ৩। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বক্ষস্থল দলন ৪। খাপরা দিয়ে নাসিকাকর্ণ মর্দন ৫। মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ ৬। পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া ৭। গায়ে বিছুটি দেওয়া ৮। হাত পা নিগড়-বদ্ধ করা ৯। কান ধরে দৌড় করানো ১০। ফাটা দু'খানা বাঁধা বাখারি দিয়ে হাত দলন করা ১১। গ্রীষ্ম কালে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্রে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে পিঠের উপর ও হাতের উপর ইট চাপিয়ে রাখা ১২। প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা ও গায়ে ইট নিক্ষেপ করা ১৩। গোণীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা ১৪। বৃক্ষে বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা ১৫। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা ১৬। চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা ১৭। কারাবদ্ধ করে উপোস রাখা ১৮। গৃহ-বন্দী ক'রে লঙ্কামরীচের ধোঁয়া দেওয়া।[১১]

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে ক্রন্দনরতা নুরুন্নেহার ও আমিরনের কথোপকথনে জমিদারদের অত্যাচারের নির্মমতা প্রকাশিত হয়েছে। নুরুন্নেহার তাঁর স্বামীর চিন্তায় আকুল হয়ে আমিরনকে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "টাকার জন্যে তাকে মেরে মেরে একেবারে খুন করে ফেলবে।" আমিরন তার জবাবে বলে, "মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি ক'র্ব্বে? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস কর্ত্তে পার্ব্বে না? নালীস ক'ল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর ক'রে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা? সে কিনা কর্ত্তে পারে?"

নুরুন্নেহারকে প্রভাবিত করার জন্যে হায়ওয়ান আলী কৃষ্ণমণি বৈষ্ণবীকে প্রেরণ করে। তার কথার মধ্যেও জমিদারদের নির্যাতনের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে :

> জমিদার দণ্ড ক'ল্লে বাঁচবার উপায় নেই। টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্য ধ'ল্লে আর এড়ান নেই। তবে তাকে ভয়ও ক'র্ত্তে হয়, তার কথাও শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ।

আকাঙ্ক্ষিত রমণীকে প্ররোচিত করার জন্য দূতী হিসেবে বৈষ্ণবী প্রেরণ সেকালে একটি রীতি ছিল, একথা আমরা বুঝতে পারি বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে এই পদ্ধতির প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করে। উদাহরণ হিসেবে ভবানীচরণের 'দূতী বিলাসে'র কথা উল্লেখ করা যায়।

কৃষ্ণমণি প্রথমে নুরুন্নেহারকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে, "আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তাহলে যত রাগ দেখছো একেবারে জল হয়ে যাবে। তুমি উল্টে আবার তার ডাবল টাকা ঘরে আনতে পার্ব্বে।" কিন্তু তাতেও বরফ গলে না দেখে কৃষ্ণমণি যা বলে তা থেকে তৎকালীন সাধারণ মানুষের এমন কি ক্ষয়িষ্ণু মানী-পরিবারের মানুষদের অসহায় অবস্থাও চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে :

> সেও ভদ্র সন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? ···দেখ জমীদার, সে কিনা ক'র্ত্তে পারে? তোমায় ধ'রে নিয়েও যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে। জবরাণ কল্লেও তো ক'র্ত্তে পারে। সে যখন পণ করেছে, তখন ছাড়বে না, কখনই তোমায় ছাড়বে না। তবে কোন্ অপমানে কুল মজাবে? মান থাকতে আগেই গিয়ে তাঁর কাছে কাতর হয়ে পড় আদর পাবে। তিনি যা বলেন তাইতে রাজী হওগে মা। তুমিই যে একা এ কাজ ক'চ্ছো তা তো নয়; জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কণে বৌ পৰ্য্যন্ত এ কাজ করেছে; চৌধুরীদের কথা শোননি? ওমা! তারা আস্ত ডাকাত। পাড়া পড়শী জ্ঞাত কুটুম, পেৰ্জ্জার ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার উপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে? কে কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে, তার ভিটে মাটী একেবারে উলকুড় উটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু প্রলোভন ও প্রবোধেও কাজ না হয় দেখে বৈষ্ণবী নুরুন্নেহারকে ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু তাতেও কোন ফলোদয় হয় না। ফলে কৃষ্ণমণি তাকে শাসাতে শাসাতে চলে যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে হায়ওয়ান আলীর আড্ডায় সমকালীন কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমেই এসেছে গৌরী নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারটি তাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল। এই গৌরী নদীর উৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীকে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর আত্মজীবনীতে সরস ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন।

সমসাময়িক প্রসঙ্গের মধ্যে বিধবা বিবাহের ব্যাপারটিও এসেছে। হিন্দু বিধবাদের বিয়ে হচ্ছে শুনে হায়ওয়ান আলী বলে, "আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুর মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তার কাজ নাই, পাবনায় সেদিন রাঁড় কনে আর তার বরকে বাসর ঘরেই পাড়ার হিঁদুরা জুটে পুড়িয়ে ফেলছিল—।" এ থেকে সামন্ত প্রভু হায়ওয়ানের নারী লোলুপতার সর্বগ্রাসিতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তৎকালীন বিধবাবিবাহ এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার চিত্রও পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহের ও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র। এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে। কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্যন্ত অল্পদেশীয় লোকের দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধ হয় যে তৎপ্রতি তাহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে

> অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয় তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।[১২]

সমকালীন প্রসঙ্গের মধ্যেটি এ দেশীয়দের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার ইংরেজদের তৎকালীন প্রবণতাকে এ গর্ভাঙ্কে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে নয়—নিছক অর্থনৈতিক কারণে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে যে এদেশীয়দের অনেকে এ ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছিল এ ব্যাপারটি এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথম মোসাহেবের উক্তি এর প্রমাণ বহন করে, "হুজুর খৃষ্টান হওয়া মিছেমিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয়, তবে যে গিয়েছিল সে কোন কাজ পাবার লোভে। ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তাঁর কোন মতেই বিশ্বাস নেই।" এ ব্যাপারে এদেশীয়দের সচেতন প্রতিক্রিয়ার চিত্র তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য :

> এই বঙ্গদেশ ইংরেজ লোক কর্ত্তৃক সম্যকরূপে অধিকৃত তন্মধ্যে প্রথমাবধি ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহারদিগের বাক্য এবং ক্রিয়ার দ্বারা সর্বসাধারণের এমত দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহারা অধীনস্থ প্রজাবর্গের ধর্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং সকলে যে আপন আপন বন্ধ্যানুসারে তদনুষ্ঠানে যত্নবান থাকেন এই তাঁহার-দিগের কেবল মানস। পরমেশ্বরের কৃপায় তাহারদিগের হিন্দুস্থান রাজ্যাধিকার এবং শাসন বিষয়ক ক্ষমতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণা হইয়াছে, কিন্তু বিংশতি বৎসরাবধি কতকগুলীন মিসনরী নামে বিখ্যাত ইংলণ্ডীয় লোকেরা এদেশীয় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকে প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টধর্মে আনিবার জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইতেছে, তাহার প্রথম উপায় নানাবিধ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পুস্তকাদি যাহাতে উভয় ধর্মের নিন্দাবাদ এবং হিন্দুদিগের দেবতা এবং প্রাচীন মহাত্মাগণের প্রতি কটুকাটব্য লেখা থাকে, তাহা ছাপাইয়া বিতরণ করা। দ্বিতীয় উপায়, বাঙ্গালিদিগের দ্বারের সম্মুখে কিংবা প্রকাশ্য পথে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় গৌরব এবং পর ধর্ম্মের জঘন্যতা ঘোষণা। তৃতীয় উপায়, যদি নীচ লোকে লোভ কিংবা অন্য কোন মানসে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

> খ্রীষ্টান হয়, তবে ঐ মিসনারী মহাশয়েরা তাহাকে জোর পূর্বক প্রতিপালন এবং কর্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তদৃষ্ট অন্য লোকেও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হয়…।[১৩]

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে হায়ওয়ান জোর করে ধরে-আনা গর্ভবতী নুরুন্নেহারের আকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করে তাকে ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না, তার মোসাহেবদিগের ও প্রলোভিত করে। 'ওহো তোমরা এখানে কি ক'চ্ছো? তোমরা বুঝি ভাগ চাও না? যাও না এমন দিন আর কবে পাবে," মোসাহেবরা এ থেকে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করলে হায়ওয়ান তাদের অভয় দেয়, "তারজন্য ভয় কি? মকদ্দমা আছে—মামলা আছে, আমি আছি। যত টাকা লাগে, বেপরওয়া, জান কবুল।"

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পুলিশ এসে নুরুন্নেহারের লাশ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। দু'জন চাষী-পথিকের পুলিশ-ভীতি এ গর্ভাঙ্কে প্রকট হয়ে উঠেছে এবং এ থেকেই তৎকালীন পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন রকম পুলিশী নির্যাতনের সংবাদ-সমাহার আমরা সে সময়কার পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য করি:

> "গবর্নমেন্ট পুলিশের নূতন নিয়ম করিয়া কি চমৎকার ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাহারা রক্ষকের পদে নিযুক্ত আছে, তাহারাই সর্বভক্ষক হইয়াছে, আমরা পুনঃ ২ সারজন, থানাদার, চৌকিদার প্রভৃতি অত্যাচারের বিষয় প্রমাণ দিয়া লিখিতেছি, তথাচ কর্ত্তা মহাশয়েরা তাহাতে নেত্রপাত করেন না, কয়েক দিবস হইল একজন সারজন ও কয়েকজন চৌকীদার অন্যায় পূর্ব্বক চাঁপাতলার একজন ভদ্রলোকের ভবনে প্রবেশ করত অতিশয় অত্যাচার করে, পরন্তু বটতলায় এক বেশ্যার গৃহে সে দিবস ঐরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল…।[১৪]

অর্থাৎ পুলিশদের হাত থেকেও যে সাধারণ মানুষের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় ছিল না, তার চিত্র আমরা এ খবরটির মধ্য থেকেই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি। এ অবস্থার যে খুব বেশী একটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এমনটি বলা যাবে না।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কে আদালতে বিচারের নামে প্রহসনের যে অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছিল তা সর্বসমালোচক কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। "আলালের ঘরের দুলালে"ও আদালতের অব্যবস্থার চিত্র আছে কিন্তু তা 'জমীদার দর্পণে'র মতো এতো জীবন্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কট্টর সমালোচকও 'বঙ্গ দর্শনে'র পাতায় লিখেছিলেন, 'সেশন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে। তদংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাব প্রযুক্ত পারিলাম না।"

বিচারের নামে প্রহসনমূলক আচরণের পরিচয় তৎকালীন সাহিত্যকর্মে একেবারে অনুপস্থিত নয়, একথা সত্যি, কিন্তু মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকটিতে সমকালে বিরাজমান বিচার-ব্যবস্থার মেরুদণ্ডহীনতা, ভাঁড়ামী ও অসাধুতাকে এমন অকপট ও উলঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন যার কোন তুলনা হয় না। বিচার-ব্যবস্থার অন্তঃসার-শূন্যতাকে তুলে ধরার মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের সাধারণের প্রতি মমত্ববোধ, বাস্তবনিষ্ঠা এবং অসমসাহসিকতার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে।

বিষয়বস্তু এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণে' আমরা তৎকালীন সময়ের যে পরিচয় পাই তা-যে অনেকাংশে প্রামাণিক—আমাদের এ আলোচনায় তা-ই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাই শুধু সাহিত্যিক মূল্যে নয়, সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসেবেও 'জমীদার দর্পণে'র গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-নির্দেশ

১ কাজী আবদুল মান্নান: আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, স্টুডেন্ট ওয়েজ; ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯, পৃ. ১৪৪-৪৫।

২ আলী আনোয়ার: "ব্যক্তির বিকাশ ও বাংলা নাটক"; 'ভাষা-সাহিত্য পত্র'; নবম সংখ্যা ১৩৮৮, ঢাকা, পৃ. ৬৩

৩ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত: বাংলার সামাজিক জীবন ও বাংলা সাহিত্য; সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৭৭

৪ প্রভাতকুমার গোস্বামী: উনিশ শতকের দর্পণ নাটক; শুকসারী প্রকাশক, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩০

৫ আবদুল আজীজ আল-আমান : ভূমিকা, বিষাদ-সিন্ধু (সম্পাদিত) কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. সতেরো

৬ উদ্ধৃত, সম্পাদকীয় ; "সংবাদ প্রভাকর"। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—১। প্যাপিরাস (নতুন সংস্করণ), কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৬৮

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৮ উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, ২য় সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৮১, পৃ. ২৮-২৯

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১৫

১২ বেঙ্গল স্পেক্টেটর। বিনয় ঘোষ : সাময়িপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড ; বীক্ষণ, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৭৭

১৩ সংবাদ প্রভাকর। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-৩৩

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩